প্রথম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—বিবর্তন, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবি, পরিধি ও বিষয়বস্তু (International Relations – Evolution, Definition, Nature, Claim to be an Autonomous Discipline, Scope and Subject matter)

● **ভূমিকা :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) অদৃষ্টপূর্ব ধ্বংসলীলা, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিপর্যয় পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষকে বিচলিত করে তোলে। কী করলে পৃথিবীকে যুদ্ধের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করা যায় এবং এক চিরস্থায়ী শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত হয় তা থেকেই কালক্রমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নামক বিষয়টি জন্মলাভ করে।

● **আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিবর্তন (Development of International Relations as a Field of Study) :**

একটি স্বতন্ত্র পাঠ্যবিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূত্রপাত প্রধানত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসলীলার পুনরাবৃত্তি রোধে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের মধ্যে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়, তার মধ্যেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অঙ্কুরোদ্গম হয়।

তবে একটি পাঠ্যবিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূত্রপাত বিশ শতকের গোড়ার দিকে হলেও, এর মূল বিষয়গুলির আলোচনা বহুকাল আগে থেকে শুরু। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চৈনিক দার্শনিক **মেনসিয়াস (Mencius)**, ৩২৬-২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক মেকিয়াভেলি আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের বিষয়ে অনেক কিছু লিখে যান। তবে যোগাযোগের অভাব, বহির্বাণিজ্যের সীমিত প্রসার ইত্যাদি কারণে তখনকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা আঞ্চলিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকত। তাছাড়া ঐসব লেখকের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য শাসন বিষয়ে নীতি নির্ধারণকারীদের কার্যকর পরামর্শ দেওয়া, কোনো তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করা নয়। আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপে কূটনৈতিক আত্মজীবনী, সামরিক চিন্তাভাবনা ও কলাকৌশলের ওপর আলোচনা এবং আন্তর্জাতিক আইন-বিষয়ক রচনার সম্প্রসারণ ঘটেছিল। কিছু লেখক রাষ্ট্রের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেন, তবে **ক্ষমতার ভারসাম্য** (Balance of Power)-কেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিরূপে গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক বিষয়ে সুসংবদ্ধ আলোচনার সূত্রপাত হয় বিশ শতক থেকেই ("It was not until the twentieth century that attempts at systematic analysis appeared". —K. J. Holsti)।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশীয় ও ইউরোপীয় রাজনীতিতে বেশি মাত্রায় জড়িয়ে পড়তে থাকলে একদল মার্কিন লেখক আন্তর্জাতিক সমস্যা বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **ড. পল রেইনস্চ** (P

Reinsch) '*World Politics at the End of the Nineteenth Century*' শীর্ষক যে গ্রন্থটি রচনা করেন তাতে জাতীয়তাবাদ, জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ, জার্মান সাম্রাজ্যের রাজনীতি, চিনের সমস্যা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা স্থান পায়। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, ওই সময় ইউরোপেও বিশেষ করে ইংল্যান্ডের বেশ কিছু লেখক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে ১৯০৯ সালে ইংরেজ লেখক **স্যার নর্মান আঞ্জেল** (Sir Norman Angell)-এর লেখা '*The Great Illusion*' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনার বিকাশে এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য অবদান জোগায়। তবে এইসব লেখকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। তাঁদের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছিল আইন, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সুসংবদ্ধ তাত্ত্বিক ধারার সন্ধান পাওয়া যায় ১৯২০-এর দশক থেকে। ওই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টির বিবর্তন ঘটেছে মূলত তিনটি ভিন্ন ধারায়, যথা—

(i) **আদর্শবাদী ধারা** (১৯২০-এর দশক থেকে ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত);
(ii) **বাস্তববাদী ধারা** (১৯৩০-এর দশকের শেষ থেকে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত);
(iii) **সমাজ বিজ্ঞানভিত্তিক ধারা** (১৯৫০-এর দশকের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত)।

(i) **আদর্শবাদী ধারা :** প্রথম ধারাটি অর্থাৎ আদর্শবাদী ধারার সূত্রপাত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। এই ধারার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল প্রধানত উড্রো উইলসনের চিন্তা-ভাবনা। এই ধারার প্রবক্তাগণ মনে করতেন যে, মানব চরিত্র মূলত সহযোগিতামূলক এবং শান্তিপ্রিয়। দ্বিতীয়ত, মানবসভ্যতার অগ্রগতির মূলে আছে মানুষের এই সহযোগিতার মনোভাব। তৃতীয়ত, মানুষ যদি খারাপ কাজ করে, তার জন্য সে যত না দায়ী, তার থেকে অনেক বেশি দায়ী তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক কাঠামো। দেশে দেশে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার পিছনে কাজ করে ত্রুটিপূর্ণ আন্তর্জাতিক কাঠামো। চতুর্থত, যুদ্ধ বা নৈরাজ্য কখনই আন্তর্জাতিক সমাজের স্থায়ী রূপ হতে পারে না। পঞ্চমত, আদর্শবাদীদের মতে যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যের অবসান ঘটানোর জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক স্তরে যৌথ প্রচেষ্টা। এককথায় আদর্শবাদীরা এমন একটা বিশ্ব গঠনের পরিকল্পনাকে বাস্তবসম্মত বলে মনে করেন যেখানে শান্তি চিরস্থায়ী হবে এবং যা নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।

(ii) **বাস্তববাদী ধারা :** আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তি ও নৈতিকতার দিক থেকে সমর্থনযোগ্য হলেও বাস্তবের নিরিখে তা যে খুব বেশি কার্যকর নয় তার প্রমাণ হাতে নাতেই পাওয়া গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভূতপূর্ব ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে। বস্তুতপক্ষে আদর্শবাদে যে আন্তর্জাতিক শান্তি, সৌহার্দ্য, মূল্যবোধের কথা উচ্চারিত হয়, বাস্তব রাজনীতিতে তার মূল্য যৎসামান্যই। তাই ১৯৩০-এর দশকের শেষ থেকে আদর্শবাদী লেখকদের বিরোধিতা করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটে যায় বাস্তববাদী চিন্তাধারার। এই নতুন চিন্তাধারার

প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৩৯ সালে **E. H. Carr**-এর লেখা *Twenty Years' Crisis* গ্রন্থটির মাধ্যমে। পরবর্তীকালে মরগেনথউ (H. J. Morgenthau), সোয়ার্জেন বার্গার, হার্বার্ট বাটারফিল্ড, জর্জ কেনান, আর্নল্ড উলফার্স, জন স্পাইকম্যান প্রমুখ লেখকের দ্বারা বাস্তববাদী তত্ত্বটি সমৃদ্ধ হয়। এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল এই যে, সর্বদেশে ও সর্বকালে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষমতা অর্জন ও তার সম্প্রসারণের তাগিদে। বাস্তববাদীদের মতে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে কোনো রাষ্ট্রেরই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সামরিক শক্তিকে ক্রমশ বাড়িয়ে যাওয়া। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির চেয়ে সামরিক শক্তিবৃদ্ধির বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটলে জাতীয় স্বার্থ পূরণের কাজটি সহজসাধ্য হয়। বাস্তববাদীদের আরও বক্তব্য হল, যৌথ নিরাপত্তার চেয়ে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে বেশি কার্যকর।

(iii) **সমাজ বিজ্ঞানভিত্তিক ধারা :** আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষণে বাস্তববাদী তত্ত্বটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলেও ১৯৬০-এর দশক থেকে এই তত্ত্বের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। **স্টানলি হফম্যান**-এর মতে বাস্তববাদী তত্ত্বে রাজনীতি ও ক্ষমতাকে সমার্থক বলে গণ্য করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বার্থপূরণে ক্ষমতা হল একটি হাতিয়ার, তাকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা অর্পণ করা বিপজ্জনক। তাছাড়া হফম্যান-এর মতে, এই তত্ত্ব ক্ষমতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য বহু শক্তিকে উপেক্ষা করেছে। বস্তুতপক্ষে আন্তর্জাতিক স্তরে গণতন্ত্রীকরণের প্রভাব, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অ-রাষ্ট্রীয় এককের (non-state actor) ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকে বিশ্বজুড়ে যে নতুন ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা সমাধান করা বা সেগুলির যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া বাস্তববাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের ক্ষেত্রেও পরিমিতি (measurement), যথার্থতা (Precision), পরিমাণ নির্ণয় (Quantification), প্রতিরূপ নির্ণয় (model-building) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানোর দাবি উঠতে থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিকাশের এই পর্যায়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনায় সাধারণ কাঠামোগত তত্ত্ব, আচরণবাদী তত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব বাড়তে থাকে। এই পর্যায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকগণ হলেন **মর্টন ক্যাপলান, কার্ল ডয়েশ্চ, হেনরি কিসিঙ্গার** ইত্যাদি।

প্রায় একইসঙ্গে ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে বাস্তববাদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে **পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তত্ত্ব** (Inter-dependence Theory)। এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল এই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি একক অপর একককে, একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রীয় সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। একেই বলা হচ্ছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। এই তত্ত্বের প্রধান দুই প্রবক্তা হলেন **রবার্ট কেওহান (Robert Keohane) ও জোসেফ নাই (Joseph Nye)**। এই তত্ত্বের মূল লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে

বিভিন্ন অ-রাষ্ট্রীয় একক, বিশেষত বহুজাতিক সংস্থাগুলি, যে ভূমিকা পালন করে চলে তার সঠিক বিশ্লেষণ। তবে ষাট ও সত্তরের দশকের এই পরস্পর নির্ভরশীলতার তত্ত্বে বর্ণিত রাষ্ট্রের ক্রমহ্রাসমান গুরুত্বের ধারণাটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

১৯৮০-এর দশক থেকে নয়া-উদারবাদের*[১] (Neo-liberalism) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে নয়া-বাস্তববাদের (Neo-Realism) উদ্ভব হয়। নয়া বাস্তববাদীগণ ধ্রুপদী বাস্তববাদের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে সচেষ্ট হন। নয়া-বাস্তববাদের সূচনা ঘটে ১৯৭৯ সালে Kenneth N. Waltz-এর *Theory of International Politics* গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ওয়ালজ তাঁর গ্রন্থে আন্তর্জাতিক কাঠামো, প্রক্রিয়া ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন পরিণামের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নয়া বাস্তববাদের মূল বক্তব্য হল এই যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রের সমান্তরাল অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা সক্রিয় থাকলেও শেষ বিচারে রাষ্ট্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী এবং বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকাই সর্বাগ্রগণ্য। নিরাপত্তাজনিত সংকট মোকাবিলায় এখনও পর্যন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রই ক্ষমতার ভারসাম্য নীতিকে অনুসরণ করে চলে।

● মার্কসীয় ধারা :

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে আদর্শবাদী, বাস্তববাদী, নয়া-উদারবাদী প্রভৃতি ধারাগুলির পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র অথচ শক্তিশালী ধারা সমান্তরালভাবে অগ্রসর হতে থাকে। এই ধারাটির অঙ্কুরোদ্গম হয় ১৯১৬ সালে মূলত লেনিন-এর লেখা *Imperialsim : The Highest Stage of Capitalism* শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তবে ১৯১৫ সালে নিকোলাই বুখারিন (N. Bukharin)-এর লেখা *Imperialsim and World Economy* গ্রন্থটিও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উভয় গ্রন্থেরই মূল বক্তব্য হল, অর্থনৈতিক উপাদানকে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা কখনই বাস্তবসম্মত হতে পারে না। ধনতন্ত্রের বিকাশ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কতখানি এবং কীভাবে প্রভাবিত করে, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে অর্থনৈতিক উপাদান কতখানি ভূমিকা পালন করে—এইসব প্রশ্নের আলোচনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মার্কসবাদী ধারা। লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, এই যুদ্ধের প্রধান কারণ হল অর্থনৈতিক লাভালাভের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ।

১৯৬০- ও '৭০ এর দশকে **আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক** (A. G. Frank), **ইমানুয়েল ওয়ালার্স্টাইন** (I. Wallerstein), **রউল প্রেবিশ** (Raul Prebisch) প্রমুখ লেখকগণ যে **বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব** (World System Theory) গড়ে তোলেন তা বহুলাংশে মার্কসীয় ধারায় প্রবাহিত, যদিও এঁদের বৌদ্ধিক আনুগত্য ভিন্নমুখী। মার্কসবাদীদের ন্যায় এইসব লেখকেরও বক্তব্য হল,

---

*[১] ১৯৬০-এর দশকের শেষ ভাগ থেকে বাস্তববাদের বিরুদ্ধে যেসব তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে সেগুলিকে সাধারণভাবে নয়া উদারবাদী (Neo-Liberalism) বলা হয়ে থাকে।

বিশ্বব্যাপী অসম ও বিকৃত উন্নয়নের পিছনে আছে বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের বিকাশ ও তার অভ্যন্তরীণ শ্রেণিসংঘাত। এরই ফলে পৃথিবী প্রধানত তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে— **কেন্দ্র (Core), প্রান্ত পরিধি (Periphery) এবং আধা-প্রান্ত পরিধি (semi-periphery)**। এঁরা আরও বলেন, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সম্পর্কের মূল চালিকাশক্তি হল ধনতন্ত্র ও তার বিশ্বজোড়া সম্প্রসারণ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনুশীলনের ক্ষেত্রে মার্কসীয় ধ্যানধারণায় পুষ্ট এই বিশ্বব্যবস্থাপনা তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঠিকই, কিন্তু সনাতন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞগণ এই তত্ত্বকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি, কারণ তাঁদের যাবতীয় চিন্তাভাবনা কেবলমাত্র রাজনৈতিক বহিরঙ্গকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অর্থনীতি তথা ধনতন্ত্রের ভূমিকাকে তাঁরা সর্বদাই আড়াল করতে চান। তবে সাম্প্রতিককালের নয়া বাস্তববাদী তত্ত্বে, বিশেষ করে **রবার্ট গিলপিন** (Robert Gilpin) প্রমুখের লেখায় অর্থনৈতিক বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে দেখা যায়। নয়া বাস্তববাদী তত্ত্বে বাণিজ্য প্রযুক্তি ও বিনিয়োগভিত্তিক যে বৃহৎ একটি কাঠামোর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়, তার সঙ্গে বিশ্বব্যবস্থাপনা তত্ত্বের শ্রেণিস্বার্থভিত্তিক বিশ্বজোড়া কাঠামোর ধারণাটির যথেষ্ট সাযুজ্য লক্ষ করা যায়।

● আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা (Definition of International Relations) :

একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিষয়টি আজকের দিনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞা নির্দেশ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা। কারও কারও মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুধু রাষ্ট্রীয় স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বিভিন্ন বেসরকারি ও আধাসরকারি পর্যায়ের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করবে। অনেকে আবার ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে আলোচনা করার পক্ষপাতী।

কে. জে. হলস্টি (K.J. Holsti)-র মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। আবার **পামার ও পারকিন্স** (Palmer and Perkins)-এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্বসমাজের সকল মানুষ ও গোষ্ঠীর সকল সম্পর্ক, মানুষের জীবন, ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, চাপ এবং প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। **এন. জি. প্যাডেলফোর্ড** এবং **জি. এ. লিঙ্কনের** মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তি, ব্যবসায়ী সংস্থা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত।

অধ্যাপক মর্গেনথউ (H. J. Morgenthau) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কথাটির চাইতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। কারণ তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হল মূলত ক্ষমতার লড়াই। নিজ রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও অক্ষুণ্ণ রাখা এবং অপরাপর

যোসেফ ফ্রাঙ্কেল (Joseph Frankel) তাঁর *International Relations* নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, নতুন তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াবদ্ধকরণ, বৈজ্ঞানিক কৌশল গড়ে তোলা ও নিজস্ব ধারণা ও ভাষা গড়ে তোলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গি, গেম থিওরি, যোগাযোগ তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক তত্ত্ব প্রভৃতি যেসব বিভিন্ন তত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনায় ব্যবহৃত হয়, তা এই শাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্যকেই প্রকাশ করে। পরিশেষে বলা যায়, সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম নবীন বিষয় হয়েও (১৯১৯ সালে এর আনুষ্ঠানিক জন্ম হয়) এবং নানাপ্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে যথেষ্ট সজীব ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু (The scope and subject matter of International Relations) :

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করার কাজটি খুবই কঠিন, কারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গতিশীল এবং এর বিষয়বস্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল। নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব, বহুসংখ্যক আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্ভব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতি, আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উত্থান ও পতন, তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব, বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা কল্পনা করা যেত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত কূটনীতিবিদ্‌দের কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণ বিদেশ নীতি অথবা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির ব্যাপারে আদৌ উৎসাহ দেখাতো না।

কার (E. H. Car) -এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রথমাবস্থায় পরম লক্ষ্যবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল ("The teleological aspect of the science of international politics has been conspicuous from the outset.")। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে যাঁরা মাথা ঘামাতেন তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পৃথিবী থেকে যুদ্ধকে নির্বাসন দেওয়া এবং শান্তিপূর্ণ নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তাই ওই সময় যুদ্ধ প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণই ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

যুদ্ধহীন পৃথিবী যে নেহাত কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছু নয়, পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ তা প্রমাণ করে দিয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ফলপ্রসূ করতে হলে প্রয়োজন বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে এগিয়ে এলেন মরগেনথাউ (H. J. Morgenthau), টমসন (K. Thompson), স্পাইকম্যান (Spykman), মার্টিন রাইট (M. Wright) প্রমুখেরা। মরগেনথাউ-এর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষমতার লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয় ("International politics, like all politics, is struggle for power"—*Politics Among Nations*)। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইকে তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির মুখ্য আলোচ্য বিষয় বলে চিহ্নিত করেছেন। ক্ষমতা, জাতীয় স্বার্থ,

শক্তিসাম্য, আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও বিশ্বজনমত, আন্তর্জাতিক আইন, সার্বভৌমিকতা, আধুনিক যুদ্ধ, নিরস্ত্রীকরণ, যৌথ নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সংগঠন, কূটনীতির ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বিষয়কে মরগেনথাউ আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।

১৯১৭ সালে **গ্রেসন কার্ক** (Grayson Kirk) পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক কাউন্সিলের রিপোর্টে ৫টি বিষয়কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেন, যথা—(১) রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি ও পরিচালনা, (২) রাষ্ট্রীয় শক্তির ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ, (৩) বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির অবস্থান ও পররাষ্ট্রনীতি, (৪) সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস এবং (৫) একটি অধিকতর স্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থা।

১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদের প্যারিস সম্মেলনে তিনটি বিষয়কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যথা (১) আন্তর্জাতিক রাজনীতি, (২) আন্তর্জাতিক সংগঠন ও প্রশাসন এবং (৩) আন্তর্জাতিক আইন।

১৯৫৪ সালে প্রণীত *"The Introductory Course in International Relations"* নামক গ্রন্থে **ভিনসেন্ট বেকার** (Vincent Baker) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় হিসাবে ৭টি বিষয়ের উল্লেখ করেন, যথা—(১) আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রধান শক্তিসমূহ, (২) আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন, (৩) জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ, (৪) জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, (৫) জাতীয় শক্তির সীমাবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণ, (৬) বৃহৎ শক্তিধর ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রনীতি, (৭) সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির ইতিহাস।

কুইনসি রাইট (Quincy Wright) তাঁর *"The Study of International Relationas"* নামক গ্রন্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্যসূচিতে ৮টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেন, যথা—(১) আন্তর্জাতিক আইন, (২) কূটনৈতিক ইতিহাস, (৩) সামরিক বিজ্ঞান ও যুদ্ধের কলাকৌশল, (৪) আন্তর্জাতিক রাজনীতি, (৫) আন্তর্জাতিক সংগঠন, (৬) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, (৭) ঔপনিবেশিক সরকার, (৮) বৈদেশিক নীতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

পামার ও পারকিনস্ (Palmer and Perkins) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় হিসাবে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল—(১) রাষ্ট্রব্যবস্থা, (২) জাতীয় শক্তি, (৩) জাতীয় স্বার্থসাধনের হাতিয়ার হিসাবে কূটনীতি, (৪) প্রচার কার্য, (৫) জাতীয় নীতি প্রয়োগের অর্থনৈতিক হাতিয়ারসমূহ, (৬) যুদ্ধ, (৭) সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ, (৮) শক্তিসাম্য, (৯) যৌথ নিরাপত্তা, (১০) আন্তর্জাতিক আইন, (১১) আন্তর্জাতিক সংগঠন, (১২) জাতীয় স্বার্থ, (১৪) আণবিক মারণাস্ত্র, (১৫) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের পররাষ্ট্রনীতি, (১৬) পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা।

কৌলম্বিস এবং উলফ (T. Couloumbis and J. Wolfe) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্যসূচিতে ১৬টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যথা—(১) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার বিশ্লেষণভঙ্গি, (২) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব, (৩) জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদ, (৪) জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা, (৫) জাতীয় স্বার্থ, (৬) জাতীয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি, (৭) কূটনীতি, (৮) যুদ্ধ, (৯) শক্তিসাম্য, (১০) আন্তর্জাতিক আইন, (১১) আন্তর্জাতিক

সংগঠন, (১২) আন্তর্জাতিক কল্যাণকর কর্মসূচি, (১৩) আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, (১৪) বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য, (১৫) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কর্মকর্তা, (১৬) মানব সভ্যতার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জসমূহ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যে আচরণবাদের (Behaviouralism) আবির্ভাব ঘটে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর তার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। ডেভিড ইস্টন, কার্ল ডয়েশ্চ, মর্টন ক্যাপলান, রিচার্ড স্নাইডার প্রমুখ আচরণবাদীদের মতে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-গোষ্ঠী যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেগুলিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিবেচ্য হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে **অধ্যাপক বার্টনের** মতটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। বার্টন বলেন, বর্তমান অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একদিকে সংকীর্ণ এবং আর একদিকে ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাক্ষেত্র থেকে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের বেশ কিছু বিষয় বাদ যাওয়ার ফলে তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। আবার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আচরণগত সংবেদনশীলতা, পরিবর্তনের দাবি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা করছে। এসব বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পূর্বেকার পাঠ্যপুস্তকগুলিতে স্থান পায়নি।

আবার কাঠামোবাদ (Structuralism) নামে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে, যার মূল কথা হল এই যে, আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গুটিকতক প্রভাবশালী পুঁজিবাদী দেশ এবং তার চারপাশে রয়েছে বিশ্বের অধিকাংশ অনুন্নত পরনির্ভরশীল দেশ। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় এই কেন্দ্র-প্রান্ত (Centre-Periphery) বিশিষ্ট সমগ্র কাঠমোটি অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা হলেন **ব্রুকাউ (S. Brucau), ওয়ালারস্টেইন (I. Wallerstein), স্কোশপল (T. Skocpol)** প্রমুখেরা। এঁদের মতে, তথাকথিত জাতীয় স্বার্থের নামে একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব নীতি অনুসরণ করে, সেগুলি আসলে ঐ রাষ্ট্রের প্রভুত্বকারী শ্রেণির স্বার্থরক্ষার উপযোগী নীতিমাত্র। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রের এইসব প্রধান্যকারী শ্রেণিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃত কর্মকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি চিরদিনের জন্য বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। এটি একটি নিত্য পরিবর্তনশীল ও গতিশীল বিষয়। আর এই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর বিষয়-সূচির পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঠান্ডা যুদ্ধ, দ্বি-মেরুপ্রবণতা, প্রতিরোধের নীতি (policy of containment), জোট নিরপেক্ষতা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রাধান্য অর্জন করলেও ধীরে ধীরে তার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির চেহারাটাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। গত শতকের ৯০-এর দশক থেকে বিশ্ব এক মেরুতে (Unipolar) পরিণত হয়েছে। গোটা বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ও তাদের কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগন-এর ওপর বিমান হানার মধ্য দিয়ে এই সন্ত্রাসবাদ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়, গোটা বিশ্বের সামনে এক নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এখন থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এসব বিষয় নিয়েও ভাবতে হবে। সুতরাং এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়সূচির মধ্যে নতুন যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন সেগুলি হল ঃ **বিশ্ব রাজনীতিতে একমেরুপ্রবণতা, বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্যবাদ, গ্যাট, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা, পারমাণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারণ-রোধ চুক্তি, সার্ক, সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীসহ অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি, বিশ্বায়ন, আঞ্চলিকতাবাদ, উন্নয়ন, মানবাধিকার ইত্যাদি।**

তথ্যসূত্র :

১। নির্মলকান্তি ঘোষ, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, পৃষ্ঠা ৫৯, থেকে উদ্ধৃত।

২। James N. Rosenau (ed.), *Domestic Sources of Foreign Policy, P. 2.*

৩। Bandopadhyaya, opcit, P. 98-99.

৪। Joseph Frankel, *International Relations in a Changing World, P. 74.*

৫। N. D. Palmer and H. C. Perkins, *International Relations*, CBS Publishers and Distributors, Indian edition, 3rd edition. P. XII

৬। A. A. Said (ed.) *Theory of International Relations : The Crisis of Relevance*, P. 1.